পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
Environmental Management

১১

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভূমি, কৃষি, পানিসম্পদ, জীববৈচিত্র্য, অবকাঠামো প্রভৃতি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে পরিবেশে কোনো নেতিবাচক পরিবর্তন হলে বৈশ্বিক পরিবেশের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী নিয়ামকসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বেড়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৮২ বৎসর মেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ গ্রহণ করেছে (জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮)। পরিবেশের সকল উপাদানকে বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোগ,পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি বিবেচনা করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কনভেনশন, আইন ও নীতিমালা প্রণযন করা হয়েছে। বাংলাদেশেও প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা রয়েছে। আলোচ্য ইউনিটে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ নীতি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল, পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, আইন এবং চুক্তি এবং পরিবেশ বিষয়ক বাংলাদেশের নীতি, আইন এবং বিধিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ নীতি
পাঠ - ১১.২: পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল
পাঠ - ১১.৩: পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, আইন এবং চুক্তি
পাঠ - ১১.৪: পরিবেশ বিষয়ক বাংলাদেশের নীতি, আইন এবং বিধিমালা

পাঠ-১১.১ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ নীতি
Environmental Management and Environmental Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা (Management) হলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া (Definite Process) । ব্যবস্থাপনা প্রধানত প্রধান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা - পরিকল্পনা (Planning), সাংগঠনিক স্তর (Organizational level), নেতৃত্ব (Leadership) এবং নিয়ন্ত্রণ (Controlling) । ব্যবস্থাপনার এই চারটি স্তরই পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত। চিত্র- ১১.১ লক্ষ করুন। অপরদিকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হলো পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশগত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া (Process) । পরিবেশ

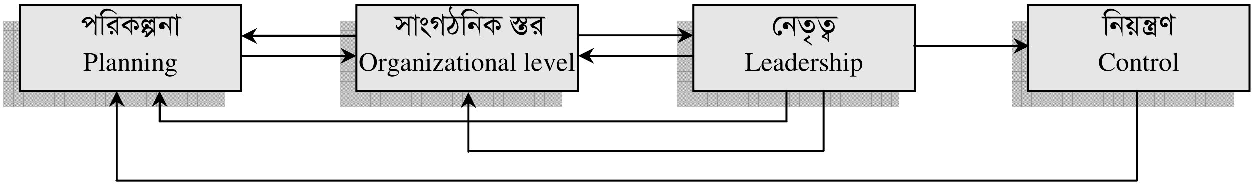

চিত্র - ১১.১ ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনার প্রথম এবং প্রধান ধাপটি হলো পরিকল্পনা।পরিকল্পনা হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌক্তিক উপায় বা সুচিন্তিত নির্দেশনা। পরিবেশ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) এর মাধ্যমে পরিবেশের সংরক্ষণ। বিস্তারিতভাবে বলা যায় - প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সর্বোপরি সুশাসনের বিষয়াদি বিবেচনা করে উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করতে পরিবেশিক কার্যক্রমের সার্বিক কাঠামো নির্ধারণই হলো পরিবেশ ব্যবস্থাপনা।

পরিবেশ নীতি
Environmental Policy

পরিবেশ বিষয়ক সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিধিবদ্ধভাবে যে সকল দিক-নির্দেশনা তৈরি করা হয় তাকে পরিবেশ নীতি বলে । বিজনেস ডিকশনারি (Business Dictionary) অনুযায়ী নীতি (Policy) হলো- এমন একটি মৌলিক নীতি যার দ্বারা একটি সরকার পরিচালিত হয় এবং ঘোষিত লক্ষ্য যা একটি সরকার বা দল অর্জন করতে চায়।

- Oiver M. Brandes and David B. Brooks এর মতে- "Policy can be defined as a Course of action or principle adopted or proposed by a government party, business or individual."অর্থাৎ, নীতি হলো কার্যের গতিপথ অথবা নির্দিষ্ট নীতি যা সরকার, দল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজে প্রস্তাব করে বা অর্জন করে।
- John Mc Cormick এর মতে- "Environmental Policy refers to the commitment of an organization to the laws, regulations and other Policy mechanisms concerning environmental issues."অর্থাৎ, পরিবেশগত ইস্যুগুলোর সাথে সম্পর্কিত আইন বিধি ও অন্যান্য নীতি প্রক্রিয়ার প্রতি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিই হলো পরিবেশ নীতি।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

Environmental Management

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের মৌলিক ইস্যুজসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন কার্যক্রমকে এমনভাবে টেকসই করা যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে পরিবেশকে বর্তমানে উপভোগ করা যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশকে সংরক্ষণ করা যায় । পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ নীতি তৈরি করা হয়। প্রতিবেশভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশগত দুর্যোগের হ্রাস এবং অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় নীতি অনুসরণ করা হয়, যেমন–

১। **স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা রক্ষা নীতি (The Principle of Protection on health and Safely):** পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশগত নীতি প্রণয়নের সময় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবকূলের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন- কৃত্রিমভাবে তৈরি সাফারি পার্কে প্রাণীদের জন্য প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে অপরদিকে মানুষের পরিদর্শনের জন্য নিরাপত্তা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে প্রতিবেশভিত্তিক ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা রক্ষা নীতিতে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, স্থানীয় গোষ্ঠী, শিশু, নারী, বয়োবৃদ্ধ, পঙ্গু এবং পরিবেশগত বিপদ ব্যবস্থাপনাও গুরুত্ব দিতে হবে।

২। **মাল্টি-সেক্টরাল সমন্বয় নীতি (The Principle of multi-Sectoral Integration):** পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হলো একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া (Integrated Process) । পরিবেশের সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করে পরিবেশগত নীতি তৈরি করতে হবে কারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশের পরিবেশগত সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে। যেমন- জমিতে রাসায়নিক সার অধিক ব্যবহার করলে ফলন অধিক হবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে কিন্তু পরিবেশগত ঝুঁকি হিসেবে মাটির উর্বরতা কমে যাবে। সেই ক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। **সাবধানতার নীতি (Precortionary Principle):** পরিবেশগত বিষয়সমূহের ভারসাম্য রক্ষা করে। যে কোনো উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যেমন- পদ্মা ব্রিজের জন্য আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে কিন্তু এই ব্রিজ পরিকল্পনার আগে নদীর নাব্যতা রক্ষা, নদীর স্রোত পরিবর্তন অর্থাৎ নদী সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ব্রিজের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। **অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertainity Principles):** প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা দেখা যায়। সামাজিক পরিবেশে ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত নীতির বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ্য অর্জন অনিশ্চিতও হতে পারে।

৫। **আন্তঃউৎপাদনমূলক সমতা (Inter-Generational Equality):** পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে উৎপাদিত দ্রব্য সকলের অভাব পূরণ করে। বিশেষ গ্রুপ যেমন- শিশু, নারী, বয়স্ক গ্রুপ সকলে উপকৃত হয়। পরিকল্পনা কোনো এলাকার ওপর যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। যেমন- এমন কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যাবে না যেখানে মরুময়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বনায়ন কর্তন করে নগর এলাকা বৃদ্ধি করে জীববৈচিত্র্য নষ্ট করা যাবে না।

৬। **স্বীকৃতি ও বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ নীতি (Recognition and Preservation of diversity):** প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে আঞ্চলিক বিভিন্নতা তৈরি হয়। যেমন- নগরায়নের (Urbanization) কারণে ‘ক’ শ্রেণির কৃষি জমিকে স্বীকৃতি দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনক্ষম কৃষি জমিকে নগরায়নের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। ইকোলজিক্যাল বৈচিত্র্যতার কথা চিন্তা করে ইকোপার্ক, ইকোটুরিজম বিভিন্ন এলাকা সংরক্ষণ করা যাবে।

৭। **দূষিতকরণ নীতি (The Pollution Pays Principles):** পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে পরিবেশনীতিতে জরিমানা প্রদানের সিস্টেম করে দূষণ রোধ করা যায়। যেমন- ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করলে জরিমানার ব্যবস্থা করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৮। **প্রতিরোধ নীতি (Prevention Principles):** পরিবেশগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার চাইতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য বন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। গাছ লাগানো বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ওজোন স্তর সুরক্ষায় শিল্পকারখানার ইমিশন কমানো যেতে পারে। পানি দূষণ রোধ করার জন্য শিল্পকারখানার পানিকে শোধনাগারে শোধন করে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯। **সহায়কতার নীতি (The Principles of Subsidy):** পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে পরিবেশ নীতিতে সহায়তা (Subsidy) দেওয়া যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সুশাসনের বিষয়াদি বিবেচনা করে উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করতে পরিবেশিক কার্যক্রমের সার্বিক কাঠামো নির্ধারণই হলো পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিবেশের মৌলিক ইস্যুজসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো - উন্নয়ন কার্যক্রমকে এমনভাবে টেকসই করা যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে পরিবেশকে বর্তমানে উপভোগ করা যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পরিবেশকে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিবেশভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশগত দুর্যোগের হ্রাস এবং অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় কতিপয় নীতি অনুসরণ করা হয় যেমন– স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা রক্ষা নীতি, মাল্টি-সেক্টরাল সমন্বয় নীতি, সাবধানতার নীতি, অনিশ্চয়তা নীতি, আন্ত:উৎপাদনমূলক সমতা, স্বীকৃতি ও বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ নীতি, দূষিতকরণ নীতি, প্রতিরোধ নীতি এবং সহায়কতার নীতি।

পাঠ-১১.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল
Environmental Management Tools and Techniques

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবেশ নির্দেশকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পৃথিবীতে জীবকূলের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভর করছে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ওপর। বাংলাদেশে আবহাওয়া এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণ, নদনদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত হ্রাস প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। এছাড়াও রয়েছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোর্গ, পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি বিবেচনা করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল বর্ণনা করা হলো।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল
Environmental Management Tools and Techniques

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত হাতিয়ার ও কৌশল (Tools and Techniques) ব্যবহার করা হয়। যথা-

১.পরিবেশ নীতি
২.পরিবেশ নির্দেশক
৩.ইকো - ব্যালেন্স
৪.জীবনচক্র মূল্যায়ন
৫.পরিবেশ রিপোর্টিং
৬.পরিবেশ চার্টারস

১। **পরিবেশ নীতি (Environmental Policy):** পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবেশ নীতি হলো পরিবেশের এমন এক ধরনের দলিল যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের সকল বিধিবিধান থাকে। পরিবেশ নীতির মূল বিষয় হলো- বর্তমান প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের লিখিত নিয়ম নীতি।

২। **পরিবেশ নির্দেশক (Environmental Indicators):** পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নির্দেশকসমূহকে (Indicators) প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- জলজ বা অ্যাকুয়াটিক পরিবেশ, ভূমি ও সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, সম্পদ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন। চিত্র - ১১.২ লক্ষ করুন।

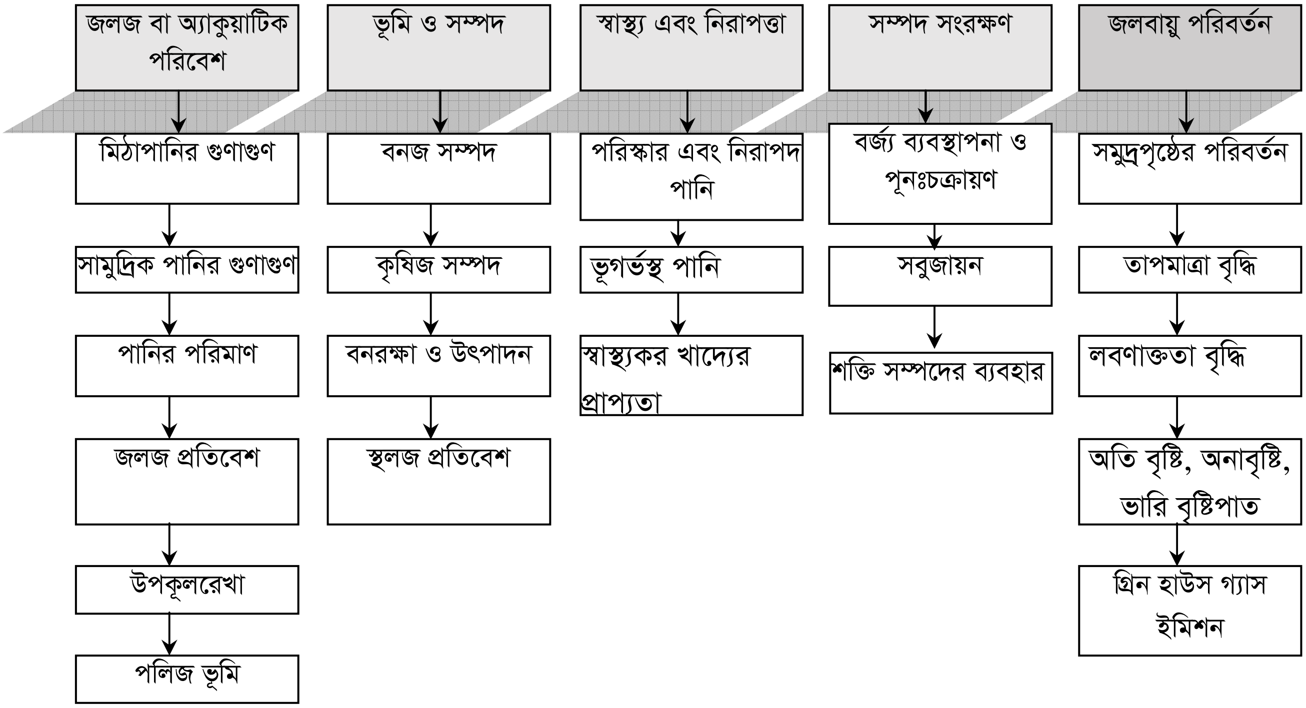

চিত্র - ১১.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নির্দেশকসমূহ

৩. **ইকো - ব্যালেন্স (Eco-Balance):** প্রতিবেশভিত্তিক ব্যালেন্স বা সাম্যতা হলো প্রতিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যকার স্থির অবস্থা (Stable equilibrium) । প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য প্রতিবেশভিত্তিক সাম্যতা বা ইকো - ব্যালেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **জীবনচক্র মূল্যায়ন (Environmental Assesment):** এটি পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়নের একটি কৌশল। যে কোনো পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যটি পরিবেশবান্ধব কি না এবং পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে তা মূল্যায়ন করা হয়।

৫. **পরিবেশ রিপোর্টি (Environmental Reporting):** পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশের প্রচারণা এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করাকে পরিবেশ রিপোর্টিং বলে।

৬. **পরিবেশ চার্টার (Environmental Charters):** পরিবেশগত চার্টারের মাধ্যমে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতির মূলবিষয়

Main Theme of the Environmental Policy of Bangladesh

পরিবেশের ওপর নির্ভর করছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবজগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন । পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, গণসচেতনতা অভাব, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, অধিক হারে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়। এছাড়াও বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যা হয়ে থাকে। এই কারণে পরিবেশনীতি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের পরিবেশনীতির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

- প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি অপরিহার্য করা;
- প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার বিজ্ঞানভিত্তিক করা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনা করতে হবে;
- প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের মূল্যায়নের সাথে সাথে প্রতিবেশ সেবারও (Ecosystem Services) মূল্যায়ন করতে হবে;
- প্রতিবেশ সেবা গ্রহণ, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলের সাম্যতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- নতুন ও নবায়নযোগ্য সকল সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করতে হবে;
- পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ এর ব্যবস্থা রাখা। এই ধরনের নীতিকে Polluter's Pay Principal বলে;
- জাতীয় নীতিসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Curative measures) চাইতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে;
- পরিবেশগত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভিযোজন (adaptation) এবং প্রশমন (mitigation) কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ;
- প্রতিবেশ হতে প্রাপ্ত পণ্য ও সেবার (Ecosystem goods and Services) টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে '3R' নীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই '3R' নীতি হলো- পুর্নব্যবহার (reuse), স্বল্প ব্যবহার (reduce) এবং পুনচক্রায়ন (recycle);
- পরিবেশ নীতি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ (Sustainable Production and Consumption) কে নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্ধ রাখতে হবে;
- পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পসারণ করতে হবে;
- স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশনীতির মূল বিষয়সমূহ নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবেশনীতিতে পরিবেশ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ চিহ্নিত করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলো-

- প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিধান এবং সার্বিক উন্নয়ন;
- অভিযোজন কার্যক্রম;
- স্বল্প কার্বন নিঃসারণ প্রযুক্তির আহরণ ও প্রচলন;
- সর্বপ্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যক্রম সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়নে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষা, সক্ষমতা, জনসচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলা;
- পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ;
- পরিবেশগত ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট;
- ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ব্যবস্থাপনা।

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশের উপাদানসমূহের কোনো একটি অংশের পরিবর্তন হলে সম্পূর্ণ পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি বিবেচনা করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত হাতিয়ার ও কৌশলসমূহ হলো- পরিবেশ নীতি,পরিবেশ নির্দেশক, ইকো-ব্যালেন্স, জীবনচক্র মূল্যায়ন, পরিবেশ রিপোর্টিং এবং পরিবেশ চার্টারস। নীতি হলো কার্যের গতিপথ অথবা নির্দিষ্ট নীতি যা সরকার, দল, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজে প্রস্তাব করে বা অর্জন করে। পরিবেশ বিষয়ক সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিধিবদ্ধভাবে যে সকল দিক-নির্দেশনা তৈরি করা হয় তাকে পরিবেশ নীতি বলে। পরিবেশগত ইস্যুজগুলোর সাথে সম্পর্কিত আইন বিধি ও অন্যান্য নীতি প্রক্রিয়ার প্রতি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিই হলো পরিবেশ নীতি। পরিবেশের ওপর নির্ভর করছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবজগতের অস্তিত্ব ও মানবজাতির উন্নয়ন। এই কারনে পরিবেশনীতি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের পরিবেশনীতির মূল বিষয়সমূহ হলো–টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রতিবেশ সেবা, নবায়নযোগ্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, অভিযোজন, প্রশমন গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে '3R' নীতি (পূনঃব্যবহার, স্বল্প ব্যবহার, পুনচক্রায়ন), পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ। বাংলাদেশের পরিবেশনীতির মূল বিষয়সমূহ নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করেন। যথা- প্রাকৃতিক ভারসাম্য, অভিযোজন কার্যক্রম, দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যক্রম সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষা, সক্ষমতা, জনসচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলা প্রভৃতি।

পাঠ-১১.৩ পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, আইন এবং চুক্তি
International Environmental Convention, Laws and Agreements

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, আইন এবং চুক্তি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পরিবেশগত বিষয়াদি সর্বদা পরিবর্তনশীল, পরিবর্ধনশীল এবং সমন্বিত বিষয়। বর্তমানে পরিবেশগত ইস্যুজ ছাড়াও পরিবেশগত উপবিষয়গুলোও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির আওতায় আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২০ (জার্মান ওয়াচ) অনুযায়ী বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০২১-২০২৫)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন, ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিকভাবে, পরিবেশগত ইস্যুজ অনুসারে পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কনভেনশন, আইন এবং চুক্তিসমূহ আলোচ্য পাঠে আলোচনা করা হলো।

প্রজাতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা
Species and Biodiversity Conservation

অধিক হারে বৃক্ষ কর্তনের জন্য মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপক কৃষির জন্য ভূমির মানও হ্রাস পায়। এতে তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যাভাব দেখা যায়। যার দরুন কোনো কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয় বা অন্যত্র অভিগমন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনঃব্যবহার এবং টেকসই সরবরাহের জন্য যে কোনো প্রতিবেশে বা ইকোসিস্টেমে প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ের প্রজাতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নীতিমালা, চুক্তি ও কনভেনশনসমূহ চিত্র-১১.৩ এ দেখানো হয়েছে।

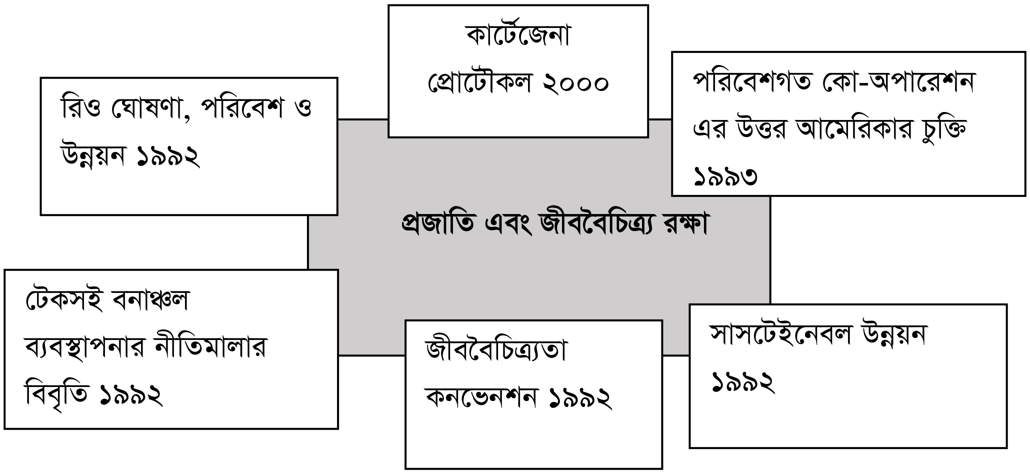

চিত্র - ১১.৩ প্রজাতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নীতিমালা, চুক্তি এবং কনভেনশনসমূহ

পরিবেশ ও উন্নয়ন (১৯৯২), এই সম্মেলনকে ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) বলে। পরবর্তীতে একে রিও কনফারেন্স (Rio conferance) বলা হয়। ইউ.এন. জেনারেল অ্যাসেম্বলির সিদ্ধান্ত ৪৪/২২৮ (২০ শে ডিসেম্বর ১৯৮৮) অনুযায়ী ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন রিও ডি জেনিরো (Rio de Jeneiro) তে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনের প্রধান দুইটি বিষয় হলো -
১। রিও - ঘোষণা (Rio Declaration) । এটি রিও+১০ (Rio+10) নামেও পরিচিত। উক্ত সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।
২। এ্যাজেন্ডা - ২১

এছাড়াও উক্ত সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য দুইটি বহুমাত্রিক চুক্তি উন্মুক্ত করা হয়। যথা-
১। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).
২। জীববৈচিত্র্যতা বিষয়ক সম্মেলন

টেকসই উন্নয়ন

Sustainable Development

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে টেকসই উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যও টেকসই উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। চিত্র ১১.৪ লক্ষ করুন। চিত্রে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ দেখানো হলো।

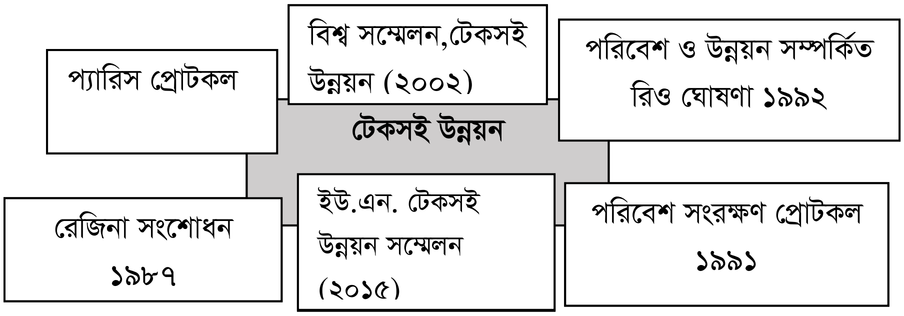

চিত্র - ১১.৪ টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ

ইউ.এন. সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৫৫/১৯৯, ২০ শে ডিসেম্বর ২০০০ অনুযায়ী ২০০২ সালের ২৪ শে আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর জোহানেসবার্গে টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশ্ব সম্মেলন (২০০২) (World Summit on Sustainable Development (2002) অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সভার উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৫ সালের ২৫-২৭ শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। যা ইউ.এন. টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (২০১৫) নামে পরিচিত। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো-বদলে দিই পৃথিবী (Transforming our World: 2030) ।

দূষণ
Pollution

দুর্যোগের সংখ্যা কমানো ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়। বায়ুমণ্ডলে বিগত ২০০ বছরে কার্বন ডবনউঅঠ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫০ শতাংশ[১]। জলবায়ু মডেল অনুযায়ী, ২১০০ শতাব্দীতে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা সম্ভবত ২$^{\circ}$C থেকে ৬$^{\circ}$C পর্যন্ত বাড়তে পারে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির প্রবণতা বিগত ২০০ বছরের মতো হয়[২]। দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে নীতিমালা, চুক্তি ও কনভেনশনসমূহ চিত্র ১১.৫ এ দেখানো হলো।

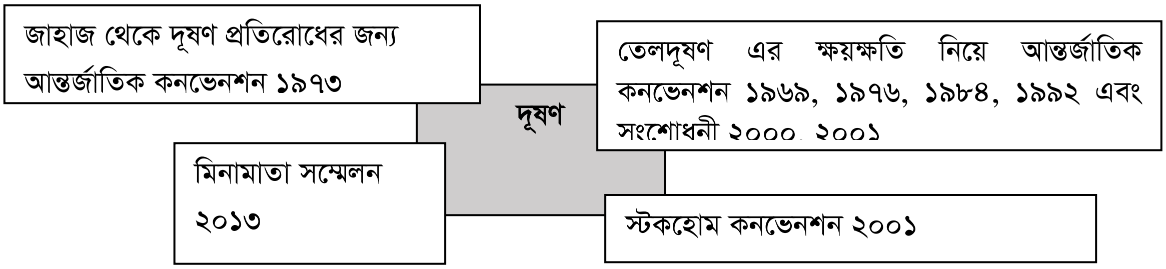

চিত্র - ১১.৫ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের নীতিমালা, চুক্তি ও কনভেনশনসমূহ

ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা
Ozone layer and Conservation of Atmosphere

বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2), সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), ওজোন (O_3) প্রভৃতি গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। ফ্রিজ, এসি এবং স্প্রে থেকে নিঃসরিত সিএফসি (CFC) গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে সর্বাধিক উত্তপ্ত করছে। ফলশ্রুতিতে ওজোন স্তরের ক্ষয় হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এমনকী সিডর, আইলার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চিত্র ১১.৬ এ ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষায়
আন্তর্জাতিক কনভেনশেন, প্রোটকল ও সংশোধনীসমূহ দেখানো হলো।

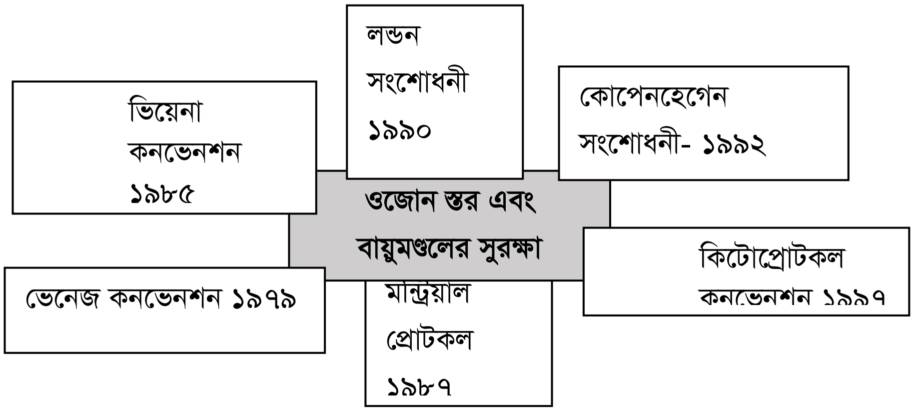

চিত্র - ১১.৬ ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক কনভেনশেন, প্রোটকল ও সংশোধনীসমূহ

[1] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

[2] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

নিউক্লিয়ার বর্জ্য

Nuclear Waste

ক্রমবর্ধমান পরিবর্তিত প্রযুক্তি, আর্থসামাজিক পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী নিউক্লিয়ার বর্জ্য ঝুঁকি তীব্র করছে। চিত্র - ১১.৭ এ নিউক্লিয়ার বর্জ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ দেখানো হলো।

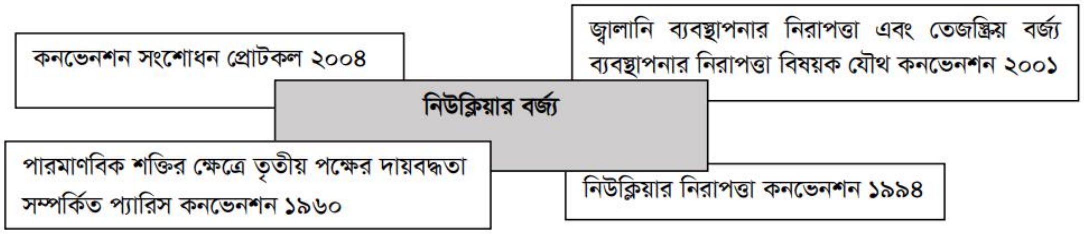

চিত্র - ১১.৭ নিউক্লিয়ার বর্জ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ

বিপদজনক বর্জ্য

Hazardous Waste

জাহাজ ভাঙ্গার ফলে নির্গত বিপদজনক বর্জ্য জলজ প্রতিবেশ বিশেষ করে সামুদ্রিক প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই বিপদজনক বর্জ্য বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়। ব্যাসেল কনভেনশন ১৯৮৯ ও ব্যাসেল কনভেনশন অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯৯৫ এ বিপদজনক বর্জ্য সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় । চিত্র - ১১.৮ লক্ষ করুন।

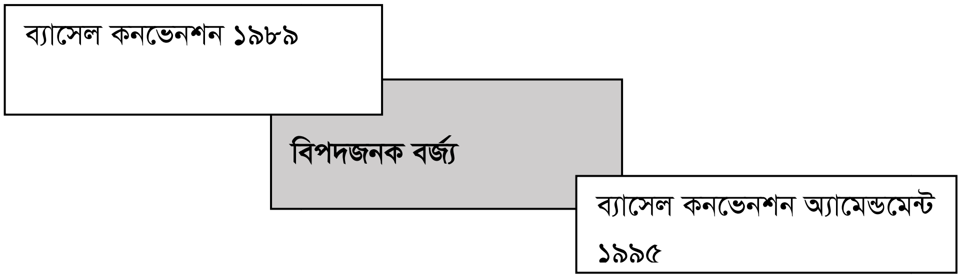

চিত্র - ১১.৮ বিপদজনক বর্জ্য সম্পর্কিত কনভেনশনসমূহ।

মহাসমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ

Ocean and Marine Resources

মহাসমুদ্রসমূহ জীববৈচিত্র্যতায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ । এ কারণে বিশ্বব্যাপী মহাসমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করেছেন সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধের কনভেনশন ১৯৯২, দক্ষিণ ব্লুফিন টুনা সংরক্ষণ সম্মেলন ১৯৯৩,

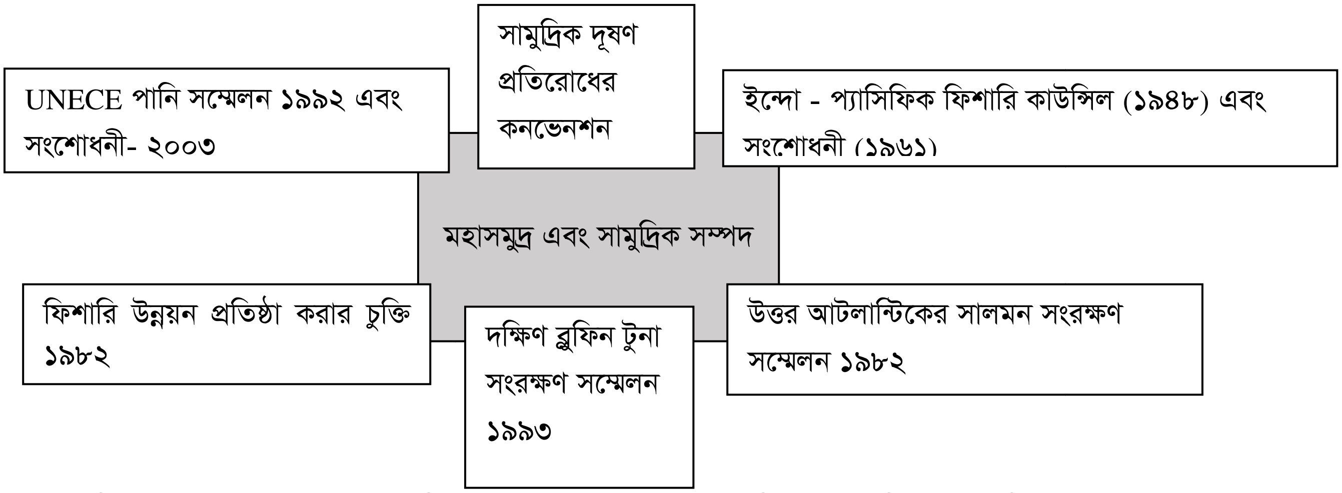

চিত্র - ১১.৯ মহাসমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধের চুক্তি ও কনভেনশন ।

উত্তর আটলান্টিকের সালমন সংরক্ষণ সম্মেলন ১৯৮২, ইন্দো - প্যাসিফিক ফিশারি কাউন্সিল (১৯৪৮) এবং সংশোধনী ১৯৬১ এবং UNECE পানি সম্মেলন ১৯৯২ এবং সংশোধনী- ২০০৩। চিত্র - ১১.৯ লক্ষ করুন।

বাণিজ্য এবং পরিবেশ

Business and Environment

বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যা ৭ বিলিয়ন এর অধিক। প্রোজেক্শন অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৮ থেকে ১০ বিলিয়ন হবে[3]। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বাণিজ্যের প্রসার এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য এবং পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশগত সহযোগিতা সম্পর্কিত উত্তর আমেরিকার চুক্তি (NAAEC) ১৯৯৩ ও আহারুস কনভেনশন ১৯৯৯ উল্লেখযোগ্য । চিত্র - ১১.১০ লক্ষ করুন ।

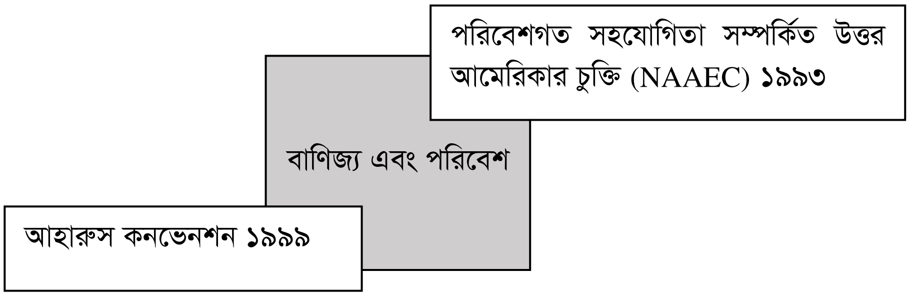

চিত্র - ১১.১০ বাণিজ্য এবং পরিবেশ রক্ষায় কনভেনশন ও চুক্তি

হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন

Hugo Framework for Action

জাপানের কোবে নগরীতে বিশ্বের ১৬৮টি দেশের প্রতিনিধি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি কমাতে ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে একটি সম্মেলন করেন। উক্ত সম্মেলন হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন নামে পরিচিত। পরিবেশ বিষয়ক উক্ত কর্মকাঠামোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য, বিভিন্নমুখী আপদ মোকাবেলার কৌশল, দুর্যোগের ভয়াবহতা ও প্রকোপ হ্রাস করা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা, ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ

United Nations Framework on Climate Change

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) গঠিত হয়। এই প্যানেলের ১৯৯০ সালে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা মোকাবেলার জন্য ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরো ধরিত্রী সম্মেলনের ইন্টার গর্ভনমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) প্রতিষ্ঠা করে। এই কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১টি করে সম্মেলন হচ্ছে যা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন নামে পরিচিত। ২০১২ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে ধনী ও উন্নত দেশসমূহকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে কিটোপ্রোটকল দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির মেয়াদ ২০১৩-২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

[3] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

UNFCCC এর একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ২০০ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে উদ্বাস্তু হবে[4]। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওর্য়াক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

SAARC Comprehensive Framework on Disaster Management

২০০৬ সালে ঢাকায় সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওর্য়াক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নামে পরিবেশ বিষয়ক আঞ্চলিক কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মকাঠামোতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (নারী, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত) ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি ও জরুরি সাড়াদান পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসঃ জাতিসংঘের ২০০০ সালের উন্নয়ন সহস্রাব্দের মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে’ রক্ষা করা। সহস্রাব্দ ঘোষণায় মূলত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এর মাধ্যমে টেকসই পরিবেশকে নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল

Sustainable Development Goal

বিশ্ব টেকসই উন্নয়নে ও পরিবেশ রক্ষায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে রিও + ২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্যারিস চুক্তি

Paris Agreement

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ফ্রেমওর্য়াক কনভেনশন (UNFCCC) এর মধ্যে প্যারিস চুক্তি ২০১৫ সালে সম্পাদিত একটি ভলান্টারি চুক্তি। এই চুক্তিতে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ প্রশমনে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের ১৯২ টি সদস্য রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

কিটো প্রোটকল

Kyoto Protocol

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (United Nations Framework Convention) কিটো প্রোটকল নামে পরিচিত।

কারটেজেনা প্রোটকল

Cartagena Protocol

বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি সম্পর্কিত জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (Bio-diversity Convention) কারটেজেনা প্রোটকল (Cartagena Protocol) নামে পরিচিত ।

মন্ট্রিল প্রোটকল

Montreal Protocol

মন্ট্রিল প্রোটকলে ওজোন স্তরের ক্ষয় (Montreal Protocol: Ozone layer Depletion) নিয়ে আলোচনা ছিল মূখ্য আলোচ্য বিষয়।

---

[4] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

ভিয়েনা কনভেনশন

Viehna Convention

ভিয়েনা কনভেনশনেও ওজোন স্তরের ক্ষয় (Ozone layer Depletion) নিয়ে আলোচনা ছিল মূখ্য আলোচ্য বিষয়।

ধরিত্রী সম্মেলন

Earth Summit

রিওডি জেনেরিওতে ৩ থেকে ১৪ জুন ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি রিও সামিট (Rio-Summit), রিও-কনফারেন্স (Rio-Conference) বা ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) নামে পরিচিত, এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (Climate Change Convention) বিষয়ক চুক্তি হয় যা পরবর্তীতে কিটো প্রোটকল (Kyoto-Protocol) নামে পরিচিত হয়।

তাছাড়াও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যথা-

১। জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (Convention on Biological Diversity)

২। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামোগত কনভেনশন (Framework Convention on Climate Change)

৩। মরুকরণ রোধে জাতিসংঘ কনভেনশন (United Nations Convention to Combat Desertification)

ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয়

Main Theme of the Earth Summit

ধরিত্রী সম্মেলনের ফলাফলকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণা

২। এজেন্ডা ২১ (Agenda- 21)

১. পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণা (Rio Declaration for Environment and Development)

পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও - ঘোষণায় ১৭টি নীতি রয়েছে। রিও - ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ হলো-

- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে মানুষ। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন করবে।
- বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়ন নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নয়নকেও সমানভাবে নিশ্চিত করে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না বরং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা, বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের চেতনার রাষ্ট্রগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।
- সকল রাষ্ট্র উৎপাদন (Production) এবং ভোগের (Consumer) ক্ষেত্রে টেকসই নয় (Non-Sustainable) এমন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রথমে হ্রাস করবে পরবর্তীতে পরিহার করবে। এতে করে উন্নত জীবন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।
- প্রত্যেক রাষ্ট্র কার্যকর পরিবেশ আইন প্রণয়ন করবে।

এছাড়াও রিও ঘোষণায় পরিবেশের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন–

- কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন (CH_4) সহ গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর নির্গমন সীমিতকরণ।

- ব্যাপকভাবে বন উজাড়করণ বন্ধ করতে হবে এবং বনজ সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে।
- তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র এবং উন্নত জাতিগুলোর ভোগ প্রবণতা কমাতে হবে।
- একবিংশ শতাব্দিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হবে।

২। এজেন্ডা ২১ (Agenda-21): রিও সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল এজেন্ডা- ২১। যেখানে চল্লিশটি অধ্যায় রয়েছে, যা চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্র- ১২.৮ লক্ষ করুন[5]।

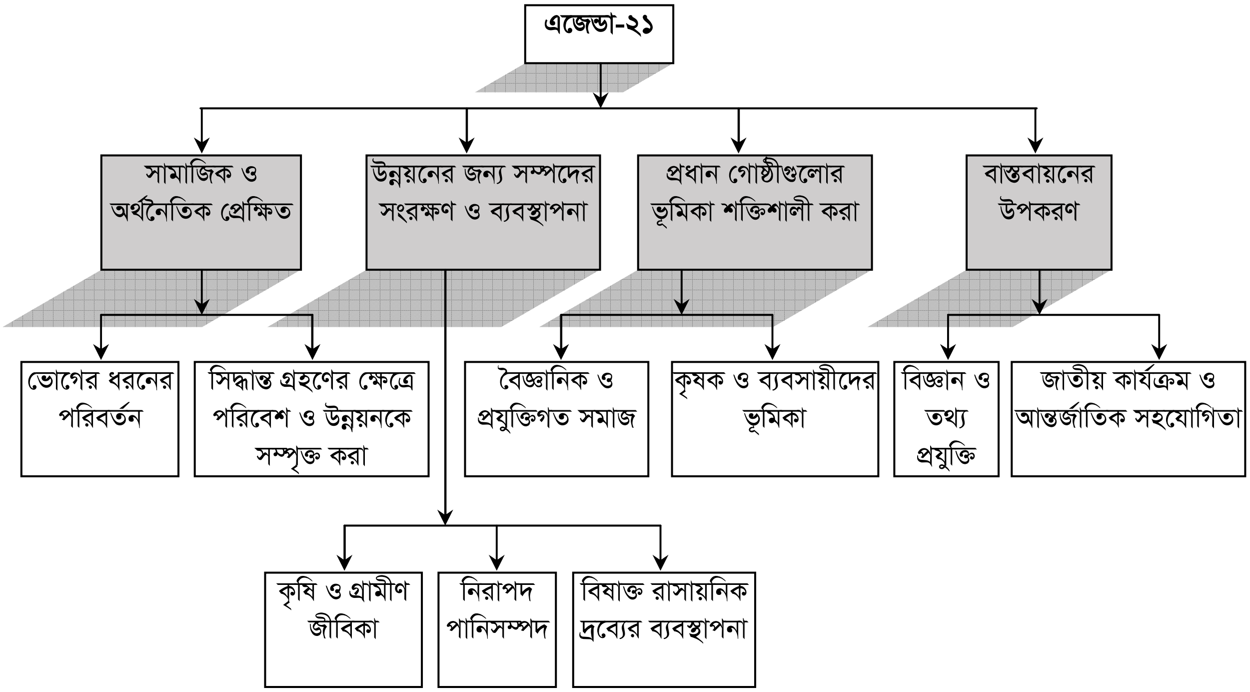

চিত্র - ১১.১১ এজেন্ডা-২১ (প্রধান চারটি পর্ব)

পরবর্তীতে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৪৭/১৯০ এবং ৫১/১৮১ অনুয়ায়ী ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন নিউইয়র্কে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যা পরিবেশ বিষয়ক সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন (১৯৯৭) (General Assembly Special Session on the Environment (1997) নামে পরিচিত। এটি ধরিত্রী সম্মেলন+৫ (Earth Summit+5) নামেও পরিচিত। এই সম্মেলনে এ্যাজেন্ডা- ২১ এর প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

[5] Strong Maurice, F, The outcome of the Rio Conference, 1992

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশগত বিষয়াদি সর্বদা পরিবর্তনশীল, পরিবর্ধনশীল এবং সমন্বিত বিষয়। বর্তমানে পরিবেশগত ইস্যুজ ছাড়াও পরিবেশগত উপবিষয়গুলোও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির আওতায় আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২০ (জার্মান ওয়াচ) অনুযায়ী বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০২১-২০২৫)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন, ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, সার্ক কমপ্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ের প্রজাতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নীতিমালা, চুক্তি ও কনভেনশনসমূহের মধ্যে জীববৈচিত্র্যতা কনভেনশন ১৯৯২, পরিবেশগত কো-অপারেশন এর উত্তর আমেরিকার চুক্তি ১৯৯৩, কার্টেজেনা প্রোটোকল ২০০০, টেকসই বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার নীতিমালার বিবৃতি ১৯৯২ ও সাসটেইনেবল উন্নয়ন ১৯৯২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। টেকসই উন্নয়নের উপর ইউ.এন. টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (২০১৫), বিশ্ব সম্মেলন,টেকসই উন্নয়ন (২০০২), পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত রিও ঘোষণা ১৯৯২, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রোটকল ১৯৯১, প্যারিস প্রোটকল, রেজিনা সংশোধন ১৯৮৭ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের নীতিমালা, চুক্তি ও কনভেনশনসমূহের মধ্যে জাহাজ থেকে দূষণ প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৭৩, তেলদূষণ এর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৬৯, ১৯৭৬, ১৯৮৪, ১৯৯২ এবং সংশোধনী ২০০০, ২০০১, মিনামাতা সম্মেলন ২০১৩ ও স্টকহোম কনভেনশন ২০০১ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক কনভেনশেন, প্রোটকল ও সংশোধনীসমূহের মধ্যে লন্ডন সংশোধনী ১৯৯০, কোপেনহেগেন সংশোধনী- ১৯৯২, কিটোপ্রোটকল কনভেনশন ১৯৯৭, মন্ট্রিয়াল প্রোটকল ১৯৮৭, ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৫ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ্বব্যাপী মহাসমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করেছেন সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধের কনভেনশন ১৯৯২, দক্ষিণ ব্লুফিন টুনা সংরক্ষণ সম্মেলন ১৯৯৩, উত্তর আটলান্টিকের সালমন সংরক্ষণ সম্মেলন ১৯৮২, ইন্দো - প্যাসিফিক ফিশারি কাউন্সিল (১৯৪৮) এবং সংশোধনী ১৯৬১ এবং UNECE পানি সম্মেলন ১৯৯২ এবং সংশোধনী- ২০০৩ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রিওডি জেনেরিওতে ৩ থেকে ১৪ জুন ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি রিও সামিট (Rio-Summit), রিও-কনফারেন্স (Rio-Conference) বা ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) নামে পরিচিত, এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (Climate Change Convention) বিষয়ক চুক্তি হয় যা পরবর্তীতে কিটো প্রোটকল (Kyoto-Protocol) নামে পরিচিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যথা- জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামোগত কনভেনশন, মরুকরণ রোধে জাতিসংঘ কনভেনশন রিও সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল এজেন্ডা- ২১। যেখানে চল্লিশটি অধ্যায় রয়েছে, যা চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত, উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রধান গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করা ও বাস্তবায়নের উপকরণ।

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক নীতি, আইন এবং বিধিমালাসমূহ
Environmental Policies, Laws and Regulations of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক নীতি, আইন এবং বিধিমালাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। যার দরুন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিবেশ ও প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে। যেমন - ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা ২০০৮ প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৫ এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১৩ ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯। প্রত্যেকটি নীতির মূল উদ্দেশ্য টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুজ অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক বাংলাদেশে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নীতিমালাসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালাসমূহ চিত্রের মাধ্যমে আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নীতিমালাসমূহ
Policies for Integrated Disaster Management

- **পানি:** পানি পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে পানি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩, উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ১৯৯৫ এবং জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯।
- **খাদ্য:** বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে খাদ্য পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ উল্লেখযোগ্য ।
- **খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি:** সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- জ্বালানি নীতি ২০০৪ এবং জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৬।
- **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন:** পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক নীতিমালা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন জাতীয় কৌশল ২০১৪, জাতীয় আর্সেনিক প্রশমন নীতি ২০০৪, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃবর্জ্য কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬।

- **কৃষি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ :** কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি করছে। ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তনেও প্রভাব ফেলছে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় - বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৮, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০০৭, জাতীয় পোল্ট্রি সম্প্রসারণ নীতি ২০০৮, জাতীয় প্রজনন নীতি ২০০৭, জাতীয় প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০১৩, নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৮৬, প্রাণী সম্পদ নীতি এবং কর্ম পরিকল্পনা ২০০৫, জাতীয় প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০১৩ ও নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৮৬ প্রভৃতি।
- **ভূমি:** সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । বাংলাদেশে ভূমি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- জাল মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৯২, চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ১৯৯৮, বালু মহাল ও বালু ব্যবস্থাপনা বিধি ২০১১, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, খাস জমি নিষ্পত্তি নীতি ১৯৯৭ এবং অকৃষি খাস জমি নিষ্পত্তি নীতি ১৯৯৫।
- **জলবায়ু পরিবর্তন :** জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো- জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩, জাতীয় বন নীতি ২০১৬, বাংলাদেশ বন প্রধান পরিকল্পনা ১৯৯৪ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ প্রভৃতি।
- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা :** সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ । সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য নীতিমালাসমূহ হলো - দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯, দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ নির্দেশিকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৫, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১১, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রভৃতি।

পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি, আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এবং অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বর্তমানে প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুক্ষীণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়নের জন্য এবং প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত-২০১০), বাংলাদেশে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রভৃতি নীতি, আইন ও বিধিমালাসমূহ উল্লেখযোগ্য। চিত্র-১১.১২ লক্ষ করুন। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ মূলত পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

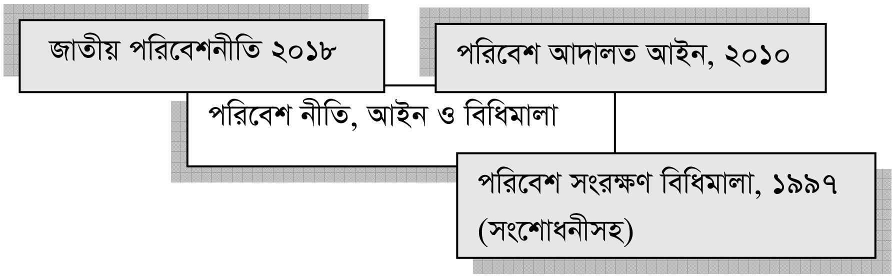

চিত্র - ১১.১২ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি, আইন ও বিধিমালাসমূহ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও আদেশ

বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৮ ক অনুচ্ছেদে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭)।
জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হলো - বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০ এবং টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯-২০১৭। এছাড়া প্রণয়ন করা হয়েছে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ প্রভৃতি। চিত্র - ১১.১৩ লক্ষ করুন।

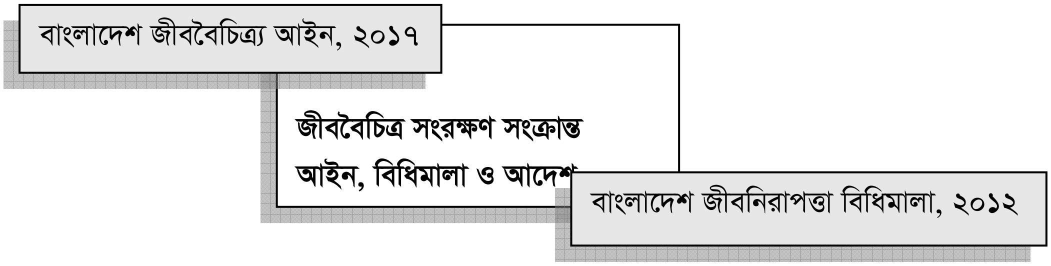

চিত্র - ১১.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও আদেশ

বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা

নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণে পরিবেশের ওপর চাপ পড়ছে। ফলে প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ইসিএ এলাকা হিসেবে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চারদিকের ১০ কি.মি. বিস্তৃত এলাকা প্রতিবেশগত ভাবে বাংলাদেশের সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং - ডাউকি নদী, নদীটির উভয় তীর ২০১৫ সালে পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রতিবেশগত ভাবে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ হচ্ছে ঝিনাইদহ জেলার মারজাত বাঁওড়, সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওড়, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওড় প্রভৃতি। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঢাকা মহানগরের পাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীকে ২০০৯ সালে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০০১ সালে গুলশান - বারিধারা লেককেও প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র ১১.১৫)।
এস, আর, ও নং ২৯১ - আইন / ২০১৬। - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

চিত্র - ১১.১৫ বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড:
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে, যথা:

১। বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ নদী, খাল-বিল প্লাবনভূমি, হাওর, বাঁওড়, লেক, জলাভূমি পাখির আবাসস্থল, মৎস অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকার অবক্ষয় প্রভৃতি ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু বা শুরু করা যাবে না।

২। পরিবেশ ও প্রতিবেশের দূষণ ও অবক্ষয় হতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

৪। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হওয়ার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি হতে পারে এমন প্রক্রিয়া চালু রাখা যাবে না।

৫। দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ নির্ণয় করে প্রতিরোধের উপায় বের করতে হবে।

৬। বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্মতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শনের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশের মধ্যে চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা, ২০১৮ এবং বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ উল্লেখযোগ্য। চিত্র - ১১.১৬ লক্ষ করুন।এস, আর, ও নং ২৯৪ - আইন / ২০০৮ - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরা বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করেন। উক্ত নীতিমালার চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে (টেবিল -১১.১) ।

টেবিল -১১.১ চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণি বিভাগ

শ্রেণি বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণি	উদাহরণ
শ্রেণি-১	সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণুমুক্ত, অসংক্রামিত)	কাগজ, ঔষধের স্ট্রিপ, স্যালাইন, গজ/তুলা, ইনজেকশনের খালি ভায়েল।
শ্রেণি-২	অ্যানাটমিক্যাল বর্জ্য	মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, টিস্যু, টিউমার, গর্ভপাত, গর্ভফুল
শ্রেণি-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	রক্ত, কফ, মল, সিরাম
শ্রেণি-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	ডায়ালাইসিসের রিএজেন্ট, ডেভলপার, রাসায়নিক দ্রব্য।
শ্রেণি-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য	বাতিল মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ
শ্রেণি-৬	সংক্রামক / জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, স্পঞ্জ, সিরিঞ্জ, (রক্ত/ পূজ/ দেহ রস দ্বারা মাখিত)
শ্রেণি-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	আইসোটোপ, এক্সরে মেশিনের হেড।
শ্রেণি-৮	ধারাল বর্জ্য	সকল প্রকার সুই, ব্লেড, এ্যাম্পুল, বোহল/ কাঁচ/ টেস্ট-টিউব/ প্লেট, পিন।
শ্রেণি-৯	পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য	অসংক্রামিত ব্যবহার্য, সিরিঞ্জ কাপড়, গজ, তুলা
শ্রেণি-১০	তরল বর্জ্য	সাকশন করা তরল, বমি, কফ, সিরাম, রক্ত
শ্রেণি-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	প্রেসারইজড, কৌটা/ ক্যান/ কনটেইনার

উৎস: চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা, ২০১৮

উক্ত বিধিমালায় ক্যাটাগরি অনুযায়ী চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন এবং বিনষ্টকরণের উপায় উল্লেখ রয়েছে। চিকিৎসা বর্জ্যের সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য বর্জ্যের বিভাগ, শ্রেণি, ধরন অনুযায়ী পাত্র এবং কালার কোড রয়েছে।

এস.আর. ও নং ৩৬৯ - আইন/ ২০১১। - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে বিপজ্জনক বর্জ্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাসেল কনভেনশন এর শর্তাবলি অনুসরণ করার জন্য উল্লেখ রয়েছে। উক্ত বিধিমালায় বিপজ্জনক বর্জ্য হিসেবে ৬৮৪ টি বিপজ্জনক পদার্থের নামে উল্লেখ রয়েছে।

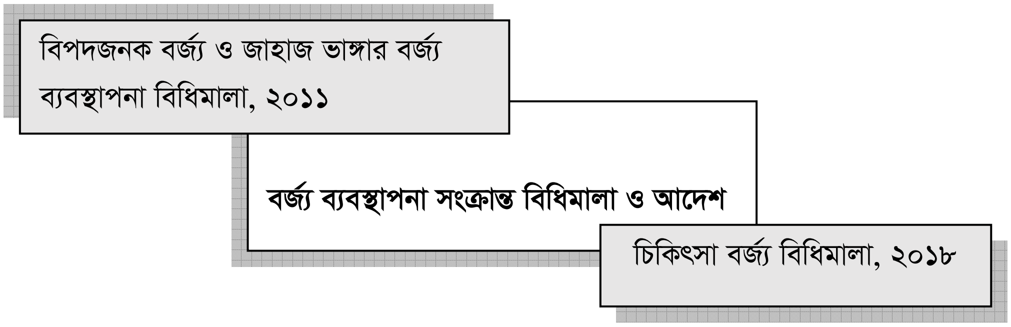

চিত্র - ১১.১৬ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন, ২০১৯ উল্লেখযোগ্য (চিত্র - ১১.১৭)।

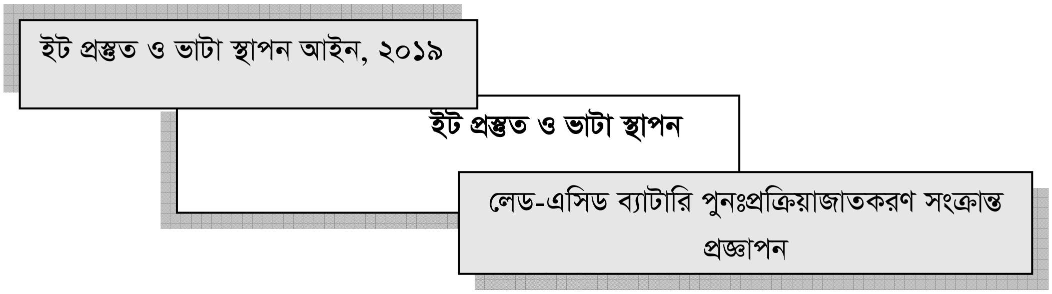

চিত্র - ১১.১৭ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন

শব্দ দূষণ সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

এস, আর, ও নং ২১২ - আইন/ ২০০৬। - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ প্রণয়ন করেন (চিত্র-১১.১৮) ।

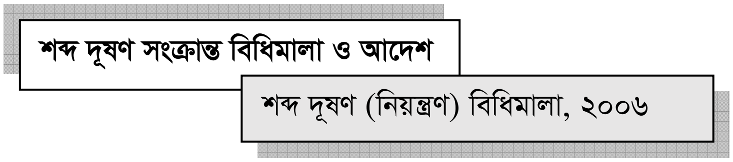

চিত্র - ১১.১৮ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

এস, আর, ও নং ৯২- আইন/২০০৪। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয় (চিত্র - ১১.১৯) ।

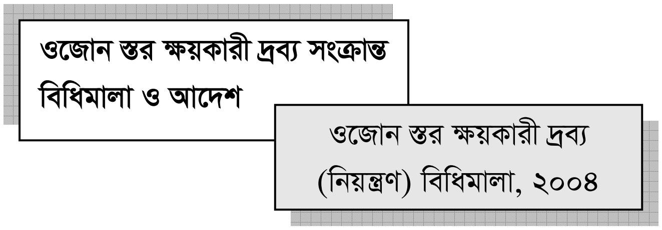

চিত্র - ১১.১৯ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংক্রান্ত বিধিমালা ও আদেশ

জাতীয় পরিবিবেশ নীতি ২০১৮

National Environmental Policy 2018

পরিবেশের সকল উপাদানকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোগ, পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করে পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়[৬]।

জাতীয় পরিবিবেশ নীতি ২০১৮ এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ

Main Theme of the National Environmental Policy 2018

- পরিবেশের সকল উপাদানকে বিবেচনা করে পরিবেশনীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে কৃষিজ উৎপাদন শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনায় - জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন , ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয় রোধ এবং ভূমি পুনরুদ্ধারে পরিবেশ সম্মত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশ ও প্রতিবেশ অঞ্চলভিত্তিক ল্যান্ড জোনিং , ভূমির অবক্ষয়, মরুময়তা, নদীর তীরক্ষয়, ভূমিধবস রোধ করতে বনায়ন ও জলাধার ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়াও পরিবেশনীতিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশের হাওড়, বাঁওড়, খাল-বিল, নদনদী, প্লাবনভূমি প্রভৃতির জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখার এবং পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বর্ষায় পানি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি খাদ্য ও পানির উৎপাদন হতে শুরু করে খাদ্য ও পানির ব্যবহার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সঠিক গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানির নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য নীতিমালা রয়েছে।
- টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ নীতিতে কৃষি নীতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে (Organic farming) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কৃষি - বনায়ন (agro-forestry), জৈব কৃষির প্রবর্তন পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় জুমচাষের পরিবর্তে তিন স্তরের পরিবেশবান্ধব কৃষি বনায়ন পদ্ধতি উৎসাহিত করা হয়েছে।
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মানসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিতে মৎস ও প্রাণী সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে নিবিড় মৎস চাষ, দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণ, এবং বিপন্ন প্রায় ও সংকটাপন্ন জলজ প্রাণীর সংরক্ষণের বিয়ষসমূহ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

[6] জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮,পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রাণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

- মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন, বনজ সম্পদ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরিবেশ নীতি ২০১৮ তে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তার জন্য বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রজাতি সংরক্ষণে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে পরিবেশ নীতিতে। সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নের জন্য পরিবেশে বিদ্যমান জেনেটিক, প্রজাতিগত ও প্রতিবেশ বৈচিত্র্য (ecosystem diversity) সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সমন্বিত পর্যায়ে কাজ করতে হবে।
- পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystems) রক্ষার ক্ষেত্রে পাহাড় প্রধান সমস্যা হলো পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস, ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, মাটি ও পানি দূষণ এবং সর্বোপরি অপরিকল্পিত নগরায়ণ। এই কারণে পরিবেশ নীতিতে, ২০১৮ পাহাড় প্রতিবেশ বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে।
- পরিবেশগত মান মাত্রা (Quality, standard) নির্ধারণের জন্য পরিবেশ পরিবীক্ষণ, দূষণ পরিমাপ, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞান, গবেষণা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়সমূহ পরিবেশ নীতি ২০১৮ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem) রক্ষায় উপকূলীয় বনাঞ্চল, খাড়ি/নদী, বালিয়াড়ি, কর্দমাক্ত ভূমি, মোহনা, সমুদ্র সৈকত, ম্যানগ্রোভ, কোরাল, উপকূলীয় কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি উপকূলীয় প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ নীতি ২০১৮ তে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে সমন্বিত উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা, প্যারাবন, উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষার জন্য পরিবেশ নীতিতে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ তে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় (Disaster Management) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধার, দুর্যোগের ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, শিক্ষা ও সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, শিল্প উন্নয়ন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ ও পরিবহন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রস্তুতি ও অভিযোজন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবস্থাপনা, আইনগত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মানব বসতি, বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান প্রভৃতি সকল বিষয় জাতীয় পরিবেশ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে।

১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে স্বতন্ত্রভাবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest (MOEF) গঠণ করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন দপ্তর। যেমন- পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন, শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট।

সংক্ষেপে, পরিবেশ নীতি ২০১৮ এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিজ্ঞানভিত্তিক করা, প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক অবদানের মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রতিবেশ সেবার (Ecosystem Services) বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রাত্যহিক কাজে এবং উন্নয়নের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূমি, পানি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অপচয় রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে। যথা- জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা ২০০৮। এছাড়াও রয়েছে পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৫ এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১৩। পরিবেশের সকল উপাদানকে বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোগ,পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিবেচনা করে পরিবিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ নীতি ২০১৮ মূলত পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ। পরিবেশ নীতি ২০১৮, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
২. পরিবেশ নীতি কাকে বলে?
৩. কতিপয় নীতি অনুসরণ করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার ও কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. বাংলাদেশের পরিবেশনীতির মূল বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
৬. আন্তর্জাতিকভাবে প্রজাতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালা, চুক্তি এবং কনভেনশনসমূহ কী কী?
৭. আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় টেকসই উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপসমূহ লিখুন।
৮. বর্তমান ও ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য দূষণ মারাত্বক পরিবেশগত সমস্যা। দূষণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ কী কী?
৯. ওজোন স্তর ও বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত কনভেনশন, প্রোটকল ও সংশোধনীসমূহ কী কী?
১০. হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন কী?
১১. ধরিত্রী সম্মেলন কাকে বলে?
১২. পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ লিখুন।
১৩. এজেন্ডা-২১ কী?
১৪. বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক কী কী নীতি, আইন ও বিধিমালা রয়েছে?
১৫. বাংলাদেশের জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮ এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।